কোনো স্কুলই খারাপ না

আব্দুল মান্নান খান

: শনিবার, ০১ মার্চ ২০২৫

লেখাপড়ার মান নিয়ে অনেক কথা আছে। দেশেও আছে দেশের বাইরেও আছে। যেমন ২০১৯ সালে বিশ^ব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছিল, ‘বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে’। এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যা শিখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। ১১ বছরের স্কুলজীবনে ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের। কাছাকাছি সময়ে আরেকটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, তৃতীয় শ্রেণীর ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণী মান অনুযায়ী বাংলা পড়তে পারে না। পঞ্চম শ্রেণীতে তা বেড়ে হয় ৭৭ শতাংশ। মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে পড়া ও লেখার সক্ষমতা অর্জনে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেগে যায়’। বলতে চাচ্ছি, ওই অবস্থার থেকে আমরা কতটুকু বেরিয়ে আসতে পেরেছি, না কি সেখানেই রয়ে গেছি। তবে আর যায় হোক এমন কিছু পরিবর্তন যে হয়নি বোধ করি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ আমরা সবাই চাই মানসম্মত যুগেপপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠুক দেশে। আমরা চাই। কিন্তু সেটা কীভাবে। বাজেটে টাকা বৃদ্ধি করতে হবে, গবেষণা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে এমন আরও অনেক কথা সুধীজনেরা বলছেন। আমি বলতে চাচ্ছি সবার জন্য মানসম্মত লেখাপড়া চাইলে অবশ্যই প্রচলিত নিয়মের বাইরে যেতে হবে। এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে দেশের প্রথমিক শিক্ষায়। প্রথমেই ঠিক করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা কোন শ্রেণী পর্যন্ত হবে। তারপর সকল শিশুর জন্য ওই শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে। একবার তো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হয়েই গিয়েছিল প্রায়। সবার মনে থাকার কথা একেবারে শেষ ধাপে গিয়ে আর হলো না। আরেকবার ২০০৯-১০ সালের দিকে হঠাৎ

করেই বলা যায় পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল সঙ্গে অষ্টম শ্রেণীতেও। দশম, একাদশ শ্রেণীতে তো আছেই। দেখা গেল বারো ক্লাস লেখাপড়া করতে চার বার পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে শিশুদেরÑ রামরাজত্ব আর কাকে বলে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা মানে সে এক দুর্নীতির মহোৎসব শুরু। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। ২০১৭-১৮ সালের ঘটনা হবে। প্রাথমিকের পাবলিক পরীক্ষায় (পিইসি) দেখা গেল সারা দেশে দেড় লাখ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। তারা পরীক্ষা দিতে আসেনি। এত পরীক্ষর্থীর অনুপস্থিতি! পত্রপত্রিকায় খবর হলো। প্রশ্ন উঠল, কেন তারা পরীক্ষায় বসল না। তারা কি আদৌ ছিল, না শুধু কাগজে-কলমে ছিল। বিনামূল্যে পাঠ্যবই উপবৃত্তির টাকা এবং সম্পূর্ণ অবৈতনিক অবকাঠামোর মধ্যে রেখে এই দেড় লাখ শিশুর জন্য পাঁচ বছরে কত কোটি টাকা গচ্ছা গেল দেশের, এ প্রশ্ন উঠেছিল। কেউ গা করেনি। 'লাগে দেবে গৌরীসেন' হিসাব-নিকাশের দরকার কী! গৌরীসেন' তো আর কেউ নন দেশের সাধারণ মানুষ। দুর্নীতির আরো ধরন-ধারণ আছে। সব বিষয়ে আশি নম্বর করে পেতে হবে না হলে জিপিয়ে ফাইভÑ গোল্ডেন হবে না। আর সেটা না হওয়া মানে জীবনটাই বরবাদ, প্রচারটা এমনই সর্বনাশা ছিল। যেন সব বিষয়েই মাস্টার্স পিএইসডি করবে আমাদের শিশুরা ভাবখানা ছিল এমন। শুরু হলো উঠতে পরীক্ষা বসতে পরীক্ষা। উঠতে কোচিং বসতে কোচিং। অবশ্য উঠতে কোচিং বসতে কোচিং আর নোট-গাইড-সহায়ক গ্রন্থের রমরমা দৌরাত্ম্য এখনও কিছু কম যাচ্ছে না। এর সঙ্গে ওদের সিলেবাস দেখলে তো ভিমরি খেয়ে পড়তে হবে। পঞ্চম শ্রেণী তো পরের কথা, একবার তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজির প্রায় চার পৃষ্ঠার একসেট প্রশ্নপত্র তুলে দিয়ে আমি বলেছিলাম, প্রশ্নপত্রখানা পড়ে আড়াই ঘণ্টায় কীভাবে ৮-৯ বছরের একটা শিশুর পক্ষে এর উত্তর করা সম্ভব। আর যদি সম্ভব হয়ও সেটা দেশের কতভাগ শিশুর পক্ষে সম্ভব। কতভাগ শিশুর সেরকম লেখাপড়া করার সুযোগ আছে দেশে'। ওই সময় এমন কথাও বলতে শুনেছি কাউকে, ওদের মাথায় যত ঢোকানো যায়, তত ওরা ধারণ করতে পারে, ওদের 'নিউরন' শক্তি এতটাই বেশি। সুতরাং শিশুদের লেখাপড়া নিয়ে 'তুগলকি কা-'র কোনো শেষ নেই। দেশের পরিবর্তীত অবস্থায় একটা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে কতকগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে। কাজও চলছে। ভালো কিছু একটা আশাও করছে মানুষ। কিন্তু মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে অর্থাৎ শিক্ষার

জন্য কোনো কমিশন গঠিত হয়নি। মৌলিক জায়গাটাই কেন যেন এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতদিন দেখা গেছে, সরকার বদল হয়েছে শিক্ষার জন্য নতুন কমিশন গঠিত হয়েছে কাজের কাজ যা-ই হোক। আর এবার যেখানে কমিশনের ছড়াছড়ি সেখানে শিক্ষার জন্য কোনো কমিশনই গঠিত হলো না। প্রায় ত্রিশ বছর প্রাথমিক শিক্ষায় চাকরি করে এসেছি। জড়িত থেকেছি নানারকম কাজে। প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে এমন দু-একটা দেশে গিয়েও তা দেখে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। তাই সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে কী করা যেতে পারে সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে তা একটু তুলে ধরতে চাইছি এখানে যেমনÑ

১. একটা শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে শতভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে। সেটা হতে পারে নবম শ্রেণী পর্যন্ত। এবং এখানেই হতে পারে তাদের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। কেননা সবাই এর পরের ধাপে লেখাপড়া করতে যাবে না। আবার এর আগে কাউকে ছেড়েও দেয়া যাবে না। দিলে আগেরটা বৃথা যাবে। শিশুশ্রম বাড়বে। এর পরে থাকতে পারে দশম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে মাধ্যমিক বা যে নামেই হোক। এখানে থাকতে পারে বিভাজন যথাÑ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক ইত্যাদি।

২. সকল শিশুর লেখাপড়া অভিন্ন কারিকুলামে হতে হবেÑ প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। গোড়াই গলদ থাকলে সেটা হোঁচট খাবে পদে পদে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা একটা অভিন্ন কারিকুলামের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে। একই ধারায় গড়ে তুলতে হবে দেশের শিশুদের। অভিন্ন কারিকুলামের অধীনে দেশের সকল শিশুকে আনা একটা কঠিন কাজ ঠিকই আবার কঠিনও না। কঠিন না এই অর্থে যে, বাংলাদেশ একটা ভাষারাষ্ট্র-জাতিরাষ্ট্র। কাজটা করতে এখানেই রয়েছে আমাদের সুবিধা। আমরা এক ভাষায় কথা বলি। ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি। আমাদের ভাষাদিবস একুশে ফেব্রুয়ারিই এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস। আর কাজটা কঠিন ধনী-গরিব বৈষম্যের কারণে যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থাকে একত্র করা। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ইস্যুটা সম্মানের সঙ্গে নিয়ে কাজটা করা।

তবে দীর্ঘমেয়াদে এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারলে কঠিন কিছুই না।

৩. ব্যাপক হারে দেশে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবেÑ সবাই তো আর উচ্চশিক্ষায় যাবে না। সেটা হয়ও না। তবে কাজ তো করে খেতে হবে সবাইকে আবার কাজ দিতেও হবে সবাইকে। গ্রামে-গঞ্জে অনগ্রসর এলাকায় সবখানে গড়ে তুলতে হবে আবাসিক স্কুল। এতে প্রয়োজন হবে বড় বাজেটের প্রয়োজন হবে মেগা প্রকল্পের। সেটা মেনে নিতে হবে। এখান থেকেই শিক্ষার্থীরা যার যার লাইনে হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখে বেরিয়ে আসবে। যে শিক্ষার্থীর যেদিকে ঝোক থাকবে সেটাই সে হাতে-কলমে শিখে বেব হবে। এখানেই হবে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। হাতে পাবে একখানা সনদ। এই সনদ অর্জন হবে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। এই সনদেই থাকবে এর পরে সে কী করবে, উচ্চশিক্ষায় যাবে নাকি অন্য কোন পেশায় যাবে। এতে করে একটা সময় আসবে যখন ওই সনদ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতে পারবে না এবং দেশে একটা দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে।

৪. স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিত্তবান অভিভাবকদের ডোনেশন দিতে হবেÑ কথা হলো বিত্তবান কারা। এই ইস্যুতে বিত্তবানদের শনাক্ত করা কোনো কঠিন কাজ না। স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সবাই তাদের চেনে । এর একটা তালিকাও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায় থেকে করে নেয়া যায়। ইচ্ছা থাকলে কঠিন কিছু না। ইনকাম ট্যাক্স অফিসও কাজে লাগতে পারে এ ব্যাপারে। প্রত্যেকেই চাইবেন তার সন্তান যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করবে সেটা ভালোভাবে সুচারুরূপে চলুক। এই যে নোট-গাইড-কোচিং, সহায়ক গ্রন্থ, এরকম নানাভাবে যদি কোনো অভিভাবককে টাকা ঢালতে না হয় তাহলে স্কুলে ডোনেট করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই হবে না বরং খুশি মনে করবে।

৫. কোনো স্কুলই খারাপ না, বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবেÑ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশু যখন এক স্কুলে পড়বে তখন আর খারাপ স্কুল বলে যে প্রচারটা করা হয় তা

আপনা থেকেই উবে যাবে। এ স্কুলে লেখাপড়া হয় না ও স্কুলে ভালো শিক্ষক নেই এসব আর থাকবে না। কেউ যদি তার সন্তানকে তার বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে পড়াতে না চান তাহলে যেখানে পড়াতে চাইবেন সেখানে গিয়ে তাকে বসবাস করতে হবে। অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্র নিয়ে যেতে হবে নিকটতম স্কুল থেকে। স্লোগান তুলতে হবে, কোনো স্কুলই খারাপ না। সবার জন্য যে মানসম্মত লেখাপড়া আমরা চাই, যে বৈষম্য কমের সমাজব্যবস্থা আমরা চাই তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে আমি মনে করি এ বিষয়টি।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা]